একে কি উন্নয়নের প্রকৃত পথ বলা যায় ?

অধ্যাপক অমিত ভাদুড়ি-র "Development with Dignity" পুস্তক নিয়ে অধ্যাপক মেহের ইঞ্জিনিয়ার, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী প্রমুখের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিকল্প প্রস্তাব সম্পর্কে একটি প্রাথমিক আলোচনা

–অতনু মিদ্যা

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় ... সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম ও বিক্ষোভের বেশ কিছু ঘটনা দেখা গেছে। প্রথম দুটি সংগ্রাম যদি দেশী-বিদেশী পুঁজির আগ্রাসী নীতিকে উন্নয়ন-এর মোড়কে হাজির করার সরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে হয়, তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গ্রাম-সমাজের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর বিরুদ্ধে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের জনগণের সংগ্রামী স্বতঃস্ফূর্ততা, পুলিশ ও শাসকপার্টির খুনে বাহিনীর সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়েও যুঝে যাওয়ার হিম্মত দেখানো স্বভাবতই সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশকেও প্রভাবিত করেছে। বুদ্ধিজীবী সমাজের একটা বড় অংশ এই সমস্ত আন্দোলনের সমর্থনে বিভিন্ন মাত্রায় সক্রিয় হয়েছেন। তবে শুধু তাই-ই নয়, শাসকশ্রেণীর নিয়ে চলা উন্নয়নের পথ-কে অপ-উন্নয়ন আখ্যা দিয়ে বিকল্প উন্নয়নের পথ নিয়ে চিন্তাভাবনাও শুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে একাংশ। এইরকম চিন্তাভাবনার প্রতিনিধিত্বমূলক ভাবনা হিসাবে আমাদের সামনে এসেছে একটি প্রস্তাব – অমিত ভাদুড়ির "Development with Dignity" বইটি নিয়ে ওয়ার্কশপ-এর মধ্য দিয়ে যে প্রস্তাবটি উন্নয়ন সম্পর্কে বিকল্প ভাবনা হিসাবে পেশ করেছেন মেহের ইঞ্জিনিয়ার, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী ও আরও কয়েকজন। বর্তমান আন্দোলনগুলোর সামনে এই প্রস্তাবের অন্তর্গত ভাবনাকে বর্তমানের "বাস্তবানুগ বিকল্প" হিসাবে হাজির করলে প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করার পদক্ষেপগুলি বর্তমান সামাজিক কাঠামোর রূপান্তর সাধনের শক্তি অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। সেই নিরিখেই তাঁদের প্রস্তাবটিকে আমরা বিচার করব। কিন্তু প্রথমে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো যে আমরা শুধু তাঁদের ভাবনার ভুল/ঠিক ধরার জন্যই এই চর্চা করছি না, সাধারণভাবে বিকল্প পথ-এর জন্য যে অন্বেষণ বুদ্ধিজীবী মহলে চিন্তাভাবনার স্তরে দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে ভাবা ও ভাবানোর লক্ষ্য নিয়ে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যই আমাদের কাছে প্রধান।

আলোচনা শুরু করা যাক উক্ত প্রস্তাবটি ধরেই। প্রস্তাবের মূল দিক দুটো: ১) পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা এবং ২) গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক মানুষের রাজনৈতিক/সামাজিক ক্ষমতায়ন। প্রথম দিকটি, অর্থাৎ পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা কী উপায়ে সম্ভব বলে তাঁরা ভেবেছেন ? নতুন কিছু নয়, কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজ-এর যে প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, তার মধ্য দিয়েই এগোনো সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেছেন। সরকারের ঘোষিত এই নীতি গ্রামীণ জনগণের পরিবার পিছু একজনের জন্য – এবং তাও সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরিতে প্রদানের ভিত্তিতে। দৈনিক মজুরি ৮০ টাকা (গড়ে) ধরে নিলে বছরে পরিবার পিছু উপার্জন দাঁড়ায় ৮০০০ টাকা, যার অর্থ দৈনিক সেই পরিবারের খরচ করার সামর্থ্য দাঁড়ায় ২২/২৩ টাকা – ৩ জনের একটি পরিবার ধরলেও দৈনিক মাথাপিছু ৮ টাকারও কম। অন্য সব কিছু বাদ দিলেও পেটভরে নয়, আধপেটা খাবারের সংস্থানও কি এভাবে সম্ভব ? এর উপর আবার সরকারের নির্ধারিত ঐ নূন্যতম মজুরির একটা অংশ কন্ট্রাক্টর ও অন্যান্য মিড্‌লম্যানদের কমিশন হিসাবে খোয়া যায়। ভারতের মহারাষ্ট্রে এই প্রকল্প Employment Gurantee Scheme নামে ১৯৭১ সাল থেকে চালু আছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৯৩ অবধি সরকারী তথ্য দেখায়: — সেখানে দৈনিক প্রকৃত মজুরি (Real wage), যেটা মজুররা হাতে পেয়েছেন তা ১.৬০ টাকা থেকে ৪.০৯ টাকার মধ্যে। [প্রকৃত মজুরি ১৯৭৭ সালে ছিল ১ টাকা ১২ আনা, ১৯৮২তে ২ টাকা ৬৩ পয়সা, ১৮৮৭ সালে ছিল ২ টাকা ৭২ পয়সা ও ১৯৯২তে ৩ টাকা ৮২ পয়সা। ঐ বছরগুলিতে টাকার অঙ্কে মজুররা দৈনিক পেত যথাক্রমে ২.৮১, ৬.২৮, ৮.২৩ ও ১৬ টাকা। (৮০ টাকা মজুরি ঐ হিসাবে কোথায় দাঁড়াবে!)] (তথ্যসূত্র: এস. মহেন্দ্র দেব-এর প্রবন্ধ India's (Maharashtra) Employment Guarantee Scheme: Lessons from Long Experience-এর

Table 5.1 থেকে উদ্ধৃত।)

তুমুল ঢক্কানিনাদের মধ্য দিয়ে একশো দিনের কাজের প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে চালু হওয়ার বছর খানেক পরই বা বাস্তবে কী হয়েছে ? সরকারি অডিট রিপোর্টের হিসাব মতো পশ্চিমবঙ্গে (সমস্ত 'lies' এবং 'damn lies'-কে 'statistics-এর মোড়কে পোরার পরও) ১০০ দিনের জায়গায় মাথাপিছু মাত্র ১৪ দিনের মত কাজ তৈরি করা গেছে" । (তথ্যসূত্র: ১১ই নভেম্বর ২০০৮ এর দৈনিক স্টেটসম্যান-এর পৃঃ-৪এ গৌরীশঙ্কর দত্তর প্রবন্ধ 'গ্রামীণ রোজগার যোজনায় একশো দিনের মধ্যে বাংলায় কাজ মিলেছে মাত্র চৌদ্দ দিনের' থেকে উদ্ধৃত)।

অন্য একটা দিক থেকেও ভেবে দেখুন। ধরা যাক ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা সবার জন্য হল এটা যদি আপাতত কথার খাতিরে সম্ভব বলে ধরেও নেওয়া হয়, তাহলেও এভাবে বছরের এক তৃতীয়াংশ ন্যূনতম মজুরিতে কাজের ব্যবস্থা করে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ কর্মহীন করে রাখার বাস্তব অর্থ কী দাঁড়ায় ? অর্থ দাঁড়ায়: পরিবারপিছু দুজনের কাজ দৈনিক ১০০ টাকা মজুরিতে ধরলেও — পরিবারটির দৈনিক গড় আয় দাঁড়ায় ৫৪ টাকা ১২ আনা। এই ক্রয়ক্ষমতার ওপর দাঁড়িয়ে হবে শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক বিকাশ!! এর অর্থ আরও দাঁড়ায় গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক গরিব মানুষের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে একমুঠো ভিক্ষান্নের জন্য হাত পেতে নতজানু হয়ে বাঁচতে বলা, সরকারি অফিসার ও গ্রামের নেতাবাবুদের পিছনে হাতজোড় করে লাইন দিয়ে কাজের জন্য তোষামোদ করে বাঁচতে বলা; বাবুদের মুখে ছোটলোক, ছোট জাত গালাগাল অহরহ হজম করে তাদের দয়া করে দান করা উপকার-এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বলা। সুতরাং অদ্ভুত লাগে না কি যখন অমিত বাবুরা তত্ত্বায়ন করেন যে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে তলাকার জনগণ নিজেদের শ্রমের মধ্য দিয়ে উপার্জন করতে শুরু করলেই তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার, মান, ইজ্জত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে! এতদিন তবে কি তলাকার মানুষেরা শ্রম করে উপার্জন করছিলেন না ? দেশের অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক, ক্ষেতমজুরদের বেশির ভাগটাই নিচু জাতের বা দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের, সেই 'স্বাধীনতা'-র পর থেকেই – তাঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মান, ইজ্জত, অধিকার এখনও তাহলে প্রতিষ্ঠিত হল না কেন ? আর সমাজের বিত্তশালী উপর মহল – মালিক, পুঁজিপতি, জোতদার – যারা আবার মূলত উঁচু জাতের, তারা তো নিজেরা শ্রম না-করে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করেই ফুলে ফেঁপে আছে – তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মান, ইজ্জত, অধিকার এতো সুপ্রতিষ্ঠিত হল কী করে ?

এছাড়া, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ভেবে দেখুন। গ্রামের গরিবদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেই তার ওপর ভর করে শিল্পায়ন-উন্নয়ন হয়, না কি কোথাও হয়েছে ? আমরা যে সাম্রাজ্যবাদী যুগে বাস করছি তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে ? সাম্রাজ্যবাদ কি কখনও কোনও পশ্চাৎপদ দেশে অবাধ শিল্পায়ন-উন্নয়ন করতে দিয়েছে ? আমরা কি এটাই দেখিনি যে, এই সাম্রাজ্যবাদ পশ্চাৎপদ দেশগুলির সামন্তবাদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আঁতাতবদ্ধ। সামন্ততন্ত্র বা তার অবশেষকে যথাসম্ভব টিকিয়ে রাখাই তো সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অন্যতম অঙ্গ, তাই না ? তারা চায় এই পুরোনো সম্পর্কগুলিকে যথাসম্ভব টিকিয়ে রেখে ওপর থেকে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংস্কারের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বিকাশ। এর ফলে পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশ হয় না। যেটুকু বিকাশ হয় তা-ও হয় থমকে থমকে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। "স্বাধীনতা"র পর ভারতবর্ষে এই অভিজ্ঞতাই তো আমরা দেখলাম। তাই ভারতবর্ষের ওপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণ উৎখাত না-করে, সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে আমূল উৎপাটিত না-করে কী জনগণের জন্য প্রকৃত শিল্পায়ন-উন্নয়ন সম্ভব ? আর এই কাজ তো টাটা-বিড়লা-আমবানিরা করবে না। কারণ তারাও, বা ভারতের বড় পুঁজিপতিরাও তো ঐ সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আঁতাতবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই কাজ করতে হবে তলাকার জনগণকেই, নিজেদেরই হাতে ক্ষমতা দখল করার মধ্যে দিয়ে, তাই না ? এর নামই তো প্রকৃত ক্ষমতায়ন, তাই না ?

এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবকদের প্রস্তাবের দ্বিতীয় দিক, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক মানুষের রাজনৈতিক/সামাজিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত ভাবনাকে ধরে কিছুটা গভীরে ঢোকার চেষ্টা করা যাক। প্রস্তাবকদের ভাবনা মতো এই ক্ষমতায়ন বাস্তবায়িত হবে পঞ্চায়েতের বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই গ্রামাঞ্চলের তলাকার মানুষের আরও অংশগ্রহণ এবং তার মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েতকে মানুষের প্রতি আরও দায়বদ্ধ করে তোলার মধ্য দিয়ে। গ্রামের পঞ্চায়েত যে বর্তমানে গ্রামীণ ধনী-মালিক, মহাজন, জোতদার, নেতা-বাবুদের ক্ষমতার আখড়া হয়ে আছে

এই বাস্তবতা তাঁরা অস্বীকার করেননি। তলাকার মানুষের ক্ষমতায়ন মানে তাহলে এই ধনী-মালিক, মহাজন, জোতদার, নেতা-বাবুদের ক্ষমতাকে চূর্ণ করে মেহনতী গরিব জনগণের ক্ষমতার প্রতিস্থাপন। আবার ধনী, মালিক, মহাজন, জোতদার নেতা-বাবুদের ক্ষমতা তো দাঁড়িয়ে আছে, নিরন্তর পুনরুৎপাদিত হচ্ছে, গ্রামসমাজের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে — যে কাঠামোকে এককথায় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বলা যেতে পারে। সেই অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলগত পরিবর্তন ছাড়া তলাকার মানুষের ক্ষমতা-র কাঠামো গড়ে উঠতে পারে কি ? একটু খুলে আলোচনা করা যাক। গ্রাম সমাজের মৌলিক আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ? প্রথমত কৃষিজমির উপর অকৃষক মালিকানা ব্যাপকভাবে এখনও টিকে আছে — এমনকি ভূমিসংস্কারের সাফল্যের ঢাক পেটানো পশ্চিমবঙ্গেও। জমির ওপর এই অকৃষক মালিকানার মধ্যে দিয়েই টিকে রয়েছে পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক। বর্গা-রেকর্ড করার যে সংস্কারকে সরকারি বামপন্থীরা ভূমি সংস্কার-এর নামে চালিয়েছে, তা কোনওভাবেই এই সামন্ততান্ত্রিক অকৃষক মালিকানার প্রাধান্যকে খর্ব করতে পারেনি, তারা তা করতে চায়ও নি। বর্গা রেকর্ড যতটুকু হয়েছে তা শুধু কিছু সংখ্যক বর্গাদারদের যখন-তখন উচ্ছেদ হওয়ার হাত থেকে নিরাপত্তা দিয়েছে — যে জমি সে চাষ করে তার মালিকানা সেই প্রকৃত চাষীর হাতে দেওয়া হয়নি। ফলে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক গরিব কৃষক (যাদের অন্যের জমিতে বা অন্য কোথাও শ্রম করে উপার্জন না-করলে চলেই না) এবং ক্ষেতমজুরদের জমির ক্ষুধা মেটেনি, তাদের শ্রমের সিংহভাগ অকৃষক জমি-মালিকদের দ্বারা আত্মসাৎ হয়ে যাওয়া অব্যাহত থেকেছে, আবার শ্রমের সুযোগ পাওয়ার জন্য এইসব জমি-মালিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন জমিতে কৃষিকাজের উপরই তাদের নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে। অকৃষক জমি-মালিক, সাধারণভাবে কৃষি ছাড়াও যাদের সরকারি-বেসরকারি চাকরি, ব্যবসা, মহাজনী কারবার ইত্যাদির মতো উপার্জনী ক্ষেত্রেও দখল থেকেছে – যার মধ্য দিয়েও তারা তলাকার মানুষের উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফাঁস আরও এঁটে বসিয়েছে। এই সামন্ততান্ত্রিক জমি সম্পর্ককে বহাল রেখে, মহাজনী প্রথাকে টিকিয়ে রেখে ছিটেফোঁটা যে পুঁজিবাদী সংস্কার হয়েছে তা এই বৈষম্য ও ক্ষমতার মেরুকরণকেই আরও তীব্রতর করেছে। যেমন, গরিব ও মাঝারি বেশ কিছু চাষী যে যৎসামান্য বা ছিটেফোঁটা খাসজমি পেয়েছিলেন, তাদের জমির অনেকটাই যে আবার অকৃষক মালিকদের হাতে চলে গেছে ও যাচ্ছে সেটা দেবব্রতবাবু বন্দ্যোপাধ্যায়-রা মধ্য ১৯৯০এর দশকেই স্টেটসম্যান-এর একটি নিবন্ধে জানিয়েছিলেন। ধনীদের ভোগ-বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার দাপটও বেড়েছে, অন্যদিকে তলাকার মানুষের উপর বেকারত্ব-ছদ্ম বেকারত্বের ফাঁস, মহাজনী ঋণের ফাঁস আরও চেপে বসেছে; শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিষেবার পণ্যায়নের ফলে জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির দেউলিয়াকরণ ব্যাপ্ত হয়েছে। এর ফলেই তো তলাকার মেহনতী মানুষকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উপরতলার বাবুদের ছড়ানো কিছু ভিক্ষান্ন পাওয়ার জন্য হাত পেতে থাকার অপমানকর অসহায়তার কবলে পড়তে হয়, তাই না ? গ্রামসমাজের এই পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ-যুক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মূলত অটুট রেখে তাই উপরতলার (অর্থাৎ অকৃষক মালিক-মহাজন-জোতদার-নেত–বাবুদের) ক্ষমতাকে যেমন চূর্ণ করা সম্ভব নয়, তেমনই তলাকার মেহনতী মানুষের ক্ষমতা প্রাপ্তিও কোনওভাবেই সম্ভব নয়। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তলাকার মেহনতী মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ, দুর্নীতিহীন, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা – এরকম যা কিছুই বলা হোক না কেন, প্রস্তাবকেরা ভেবে দেখুন তো: তা কি গ্রামাঞ্চলের উপরোক্ত ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শাসকদের দিক থেকে ছুঁড়ে দেওয়া ভিক্ষান্নকেই 'বাস্তবে যা পাওয়া সম্ভব' বলে মেনে নিয়ে তার জন্য তদ্বির তদারকি করার থেকে ভিন্ন কিছু হচ্ছে ? একেই বলব তলাকার মানুষের ক্ষমতায়ন!! নিশ্চয়ই নয়।

যে পুরোনো সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর উপরতলার ক্ষমতা দাঁড়িয়ে আছে, পুনরুৎপাদিত হচ্ছে, তাকে ভাঙতে গেলে প্রস্তাবকদের পরিকল্পনা যে নিতান্তই অকার্যকরী তা যেমন উপরের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে, তেমনই এই আলোচনা এদিকেও নির্দেশ করে যে এই কাজ সম্ভব একমাত্র গ্রামসমাজের বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক জমি-সম্পর্ককে মূলগতভাবে বদলানোর মধ্য দিয়ে। তার জন্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল অকৃষক মালিকদের কবল থেকে সমস্ত কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে তার উপর কৃষকদের মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। ইতিহাসে আমূল ভূমিসংস্কার বলতে এই কার্যক্রমকেই বলা হয়েছে – এবং এটি একটি গণরাজনৈতিক বিপ্লবী কার্যক্রম। সমস্ত মেহনতী কৃষকের বিপ্লবী উদ্যোগ, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

ছাড়া গ্রামীণ শাসকগোষ্ঠী ও বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রতিপত্তিকে উপড়ানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনই তলাকার মেহনতী মানুষের পাল্টা নিয়ন্ত্রণ প্রতিপত্তির সামাজিক-রাজনৈতিক রূপগুলোরও কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। তলাকার মেহনতী মানুষের **ক্ষমতায়ন** কাউকে **করে দিতে** হয় না। তা করা যায়ও না। এই বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সংগ্রামী মেহনতী মানুষ যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয়, তার মধ্য দিয়ে সে **নিজেই নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নেয়।** সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপরতলা থেকে কতটা কী পাওয়া যাবে তার জন্য তদ্বির তদারকির সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীতই শুধু নয়, কেবলমাত্র তার ধ্বংসাবশেষের উপরই গড়ে উঠতে পারে সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এখনকার মতো শুধু পঞ্চায়েতের হিসাব রাখা বা সরকারের দেওয়া ভিক্ষা বিতরণ করা নয়, মেহনতী মানুষ তখন সমাজের গোটা সম্পদটার উপরই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার লক্ষ্যে, ব্যাপক মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। কৃষিজমির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা ব্যাপক কৃষিজীবী মানুষ, যাদের শ্রমের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎকারীদের তারা উচ্ছেদ করতে পেরেছে, মহাজনী কারবারকে নিকেশ করতে পেরেছে, তারা নিজেদের তাগিদে কৃষিক্ষেত্রে যে দ্রুত উন্নতির/বিকাশের গতির জন্ম দেয়, তার হাত ধরে গোটা দেশের শিল্পক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশের পথও উন্মুক্ত হয়ে যায়। কর্মসংস্থানের জন্য অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নাই মামা, কানা মামা-র খোঁজ করতে করতে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মতো হাস্যকর বিকল্প-কে মাথা খুঁড়ে বার করার কোনও প্রয়োজন থাকে না। সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই গণরাজনৈতিক বিপ্লবী কার্যক্রমকে ইতিহাসের মঞ্চে উন্মোচিত হতে আমরা দেখেছি একাধিকবার। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমূল বদলে যাওয়া পুরোনো জমি সম্পর্ক ও সামাজিক পরিস্থিতিই মেহনতী মানুষের ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে, অন্য কিছু নয়। সেই জন্যই একমাত্র বিকল্প, বা বাস্তবানুগ বিকল্প — যে ভাবেই বলা হোক না কেন — শাসকশ্রেণীর আক্রমণের মুখে জেগে ওঠা গ্রামীণ জনগণের প্রতিরোধগুলোর সামনে এই কৃষি বিপ্লবের আশু প্রয়োজনীয়তাটাকেই সজোরে রাখার চেষ্টা করা উচিত আন্দোলনগুলোর বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর রূপান্তর সাধনের শক্তি অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে পারার স্বার্থে। অমিত বাবুরা এই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ কাজটির উল্লেখই এড়িয়ে গেছেন। কেন এড়িয়ে গেছেন তা অন্য আলোচনার বিষয়। কিন্তু এর ফলে তাদের সমগ্র প্রকল্পটাই, বা চিন্তাভাবনাটাই কাল্পনিক স্বপ্ন হয়ে গেল, তাই নয় কি ?

প্রসঙ্গত মনে রাখা উচিত যে নিও-লিবারেল বিশ্বায়নের বিশ্বব্যাপী পরামর্শদাতা ও উদ্গাতা বিশ্বব্যাঙ্কও তাদের "তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র প্রসার"-এর নামে উপরোক্ত ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিকীকরণ-এর প্রস্তাব দিচ্ছে বেশ কিছু বছর ধরেই। এটাও লক্ষ্য করার মতো যে, বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া দেশে তাদের অনুগামীরা — তা সে ব্রাজিলের লুলা-ই হোক বা ভারতের মনমোহন — বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নানান সংস্কার-এ নেমে পড়েছে। তাদের উদ্দেশ্য তলাকার জনগণের ক্ষমতায়ন নয়, বরং তলাকার জনগণের বিভিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ও ক্ষোভ-বিক্ষোভগুলোকে বর্তমান শ্রেণী-শাসনের কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক না-হতে দেওয়া; এই ক্ষোভ-বিক্ষোভগুলিকে বিকশিত হতে না দিয়ে এই শাসন-শোষণ ব্যবস্থার মধ্যেই টুকরো-টাকরা সংস্কারের নিরাপদ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা।

নিও-লিবারেল বিশ্বায়নকে প্রশ্ন করতে চান যে বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। তাহলে বাস্তবানুগ পথ খোঁজা-র নাম করে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধিতার প্রশ্ন এবং কৃষি বিপ্লবের মূল ও আশু প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে, কাল্পনিক ও অসার কিছু পথের সন্ধানের খোঁজে তাঁরা লিপ্ত হচ্ছেন কেন ? তলাকার মেহনতী জনগণের প্রকৃত উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কীভাবে হতে পারে সে প্রশ্নে তাদের থেকে আরও গভীর বিচার-বিশ্লেষণ-ই প্রত্যাশিত। আশা করি তাঁরা তাঁদের বর্তমান ভাবনাকে পুনর্বিচার করবেন।

<u>যোগাযোগ</u>

mid.atanu@gmail.com